নারকেলের খোলমাকড়ের মুশকিল আসান

নারকেলের শাঁস আর জলের স্বাদ তো বাঙালি মাত্রই অতি প্রিয়। গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় ও নিম্নভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নারকেল চাষ হয়ে থাকে। সেই নারকেলের খোল, ছোবড়া ও পাতাও বহুবিধ ব্যবহারের জন্য জনপ্রিয়। অর্থকরী লাভজনকও বটে। লিখছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকীটতত্ত্ব বিভাগের গবেষক দেবশিস মণ্ডল ও অমিত লায়েক

নারকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল, যা পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় ও নিম্নভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। এটি শুধু তেল ও খাদ্যের উৎস নয়, বরং নারকেলের বিভিন্ন অংশ যেমন শাঁস, জল, খোল, ছোবড়া ও পাতা বহুবিধ ব্যবহারের জন্য জনপ্রিয়। রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলাগুলিতে নারকেল চাষ সবচেয়ে বেশি করা হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, উর্বর মাটি এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত নারকেল চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

তবে, নারকেল চাষের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো নারকেল খোল মাকড় বা নারকেল পেরিয়াস্থ মাকড়ের আক্রমণ যার বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাসেরিয়া গুরেরোনিস । এশিয়া মহাদেশে নারকেল খোল মাকর প্রথমবার শ্রীলঙ্কায় ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে পুট্টালাম জেলার কল্পিটিয়া উপদ্বীপে এবং ভারতের কেরালা রাজ্যের এর্নাকুলাম জেলার অম্বালুর পঞ্চায়েতে ১৯৯৮ সালে রিপোর্ট করা হয়। প্রথম রিপোর্টের অল্প সময়ের মধ্যেই, এই মাকর দ্রুতগতিতে ভারতের প্রধান নারকেল উৎপাদনকারী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের সমস্ত ঐতিহ্যবাহী নারকেল উৎপাদনকারী রাজ্যে এই মাকড়ের উপস্থিতি রিপোর্ট করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির এক ধরনের অ্যাকারিন মাকড়, যা খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু নারকেল ফলের মারাত্মক ক্ষতি করে। এই মাকড় ফলের খোলের নিচে বসবাস করে এবং খোলের টিস্যু খেয়ে ফেলে, যার ফলে ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং গুণগত মান কমে যায়। আক্রান্ত ফলগুলি আকারে ছোট, বিকৃত এবং বাজারমূল্যহীন হয়ে পড়ে। এই মাকড়ের আক্রমণে নারকেল উৎপাদন ১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত কমে যায়, যা চাষিদের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং pভারতে নারকেল এবং তালগাছে এই মাকড়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

জীববিদ্যা:
নারকেল খোল মাকড় একটি অতিক্ষুদ্র, ক্রিম-সাদা রঙের কৃমির মতো আকৃতির প্রাণী, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০-২৫০ মাইক্রোমিটার এবং প্রস্থ ৩৬-৫২ মাইক্রোমিটার। এর শরীর লম্বাটে, নলাকার, সূক্ষ্মভাবে রিংযুক্ত এবং সামনের অংশে দুটি জোড়া পা রয়েছে। এই মাকড় এক সপ্তাহের মধ্যেই বংশ বৃদ্ধি বিস্তার করে থাকে। একটি পূর্ণবয়স্ক মাকড় প্রায় ৫০-১০০টি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে পর্যায়ক্রমে প্রোটোনিম্ফ, ডিউটোনিম্ফ এবং শেষে পূর্ণবয়স্ক মাকড়ে রূপান্তরিত হয়। সম্পূর্ণ জীবনচক্র মাত্র সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি:
মাকড়ের আক্রমণ প্রধানত কচি ফলের খোলে ঘটে, বিশেষ করে ১-৫ মাস বয়সী কুঁড়িগুলিতে। ৩ থেকে ৪ মাস বয়সী কুঁড়িতে মাকড়ের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। নিষিক্ত না হওয়া স্ত্রী ফুলে এই মাকড় থাকে না। নিষেকের পরপরই মাকড় ফলের খোলের নিচে প্রবেশ করে এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে, ফলে ডিম, নিম্ফ এবং পূর্ণবয়স্ক মাকড়ের সক্রিয় কলোনি গঠিত হয়। এই কলোনিগুলো সাধারণত পেরিয়াস্থের নিচের মেরিস্টেম অঞ্চলে দুই বা তিনটি গুচ্ছ আকারে অবস্থান করে। অনুকূল পরিবেশে মাকড়ের উচ্চ প্রজননক্ষমতা এবং সংক্ষিপ্ত জীবনচক্রের কারণে এদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যখন কলোনির আকার অনেক বড় হয়ে যায়, তখন মাকড়গুলো নারকেল ফলের টেপালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, মৌমাছি ও অন্যান্য পরাগবাহী পোকামাকড়ও এদের বিস্তারে ভূমিকা রাখে। মাকড়ের আক্রমণের লক্ষণ সাধারণত নিষিক্ত কুঁড়ির অভ্যন্তরে বসতির এক মাস পর থেকে দেখা যায়। প্রথমে পেরিয়াস্থের নিচে সাদা দাগ দেখা যায় এবং ধীরে ধীরে এটি হলুদ আভায় পরিণত হয়, যা পরবর্তীতে বাদামী রঙ ধারণ করে ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশে গুটি গুটি দাগ ও ফাটল সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ফলের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, খোল ফেটে যায় এবং কখনও কখনও অতিরিক্ত ক্ষতির ফলে কুঁড়ি ও কচি নারকেল ঝরে পড়ে বা বিকৃত আকার ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গে 'জামাইকা টল' নারকেল জাতটি এই মাকড়ের প্রতি কিছুটা সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে।

ঋতুভিত্তিক বিস্তার ও পরিবেশগত অনুকূলতা:
প্রতি মাসে একটি নতুন মুকুল বের হয় নারকেল গাছে, ফলে বছরজুড়ে মাকড় উপযুক্ত বয়সের নারকেল কুঁড়ি পেয়ে সংক্রমণ শুরু করতে পারে এবং দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। তবে, গরম ও শুষ্ক মৌসুমে এই মাকড়ের সংখ্যা সর্বাধিক হয়। বিশেষ করে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মকালীন সময়ে মাকড়ের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাকড়ের বৃদ্ধি ও বিস্তারের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। বর্ষার আগে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যেসব নারকেল গাছে প্রচুর ফল ধরে এবং ফলের থোকাগুলি ঘনভাবে গঠিত হয়, সেখানে মাকড়ের আক্রমণের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

দমন কৌশল:
নারকেল গাছে মাকড় নিয়ন্ত্রণে নিম তেল ও রসুন-সাবান মিশ্রণ স্প্রে করা কার্যকর। এটি তৈরী করতে ১০ লিটার জলে ২০ মিলিলিটার নিম তেল, ২০ গ্রাম রসুন বাটা এবং ৫ গ্রাম সাবান মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া, আজাদিরাচটিনযুক্ত বোটানিক্যাল কীটনাশক ০.০০৪% হারে স্প্রে করতে হবে। মূল খাওয়ানোর পদ্ধতিতে ৫০,০০০ পিপিএম আজাদিরাচটিন ৭.৫ মিলিলিটার বা ১০,০০০ পিপিএম আজাদিরাচটিন ১০ মিলিলিটার সমপরিমাণ জলের সাথে মিশিয়ে গাছের মূলের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। এক লিটার আজাদিরাচটিন স্প্রে দ্রবণ তৈরি করতে, ১০,০০০ পিপিএম আজাদিরাচটিন ফর্মুলেশনের ৪ মিলিলিটার নিতে হবে এবং এটি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে এক লিটার জলে মিশিয়ে নিতে হবে।

স্প্রে করার পদ্ধতি:
মাকড় গুলো নারকেল ফলের ভেতরের নরম অংশে বাসা বাঁধে এবং ফলের বাইরের আবরণ (পেরিয়াস্থ) তাদের ঢেকে রাখে, তাই স্প্রে দ্রবণটি পেরিয়াস্থ অঞ্চলে প্রয়োগ করতে হবে। এটি ক্যাপিলারি ক্রিয়ার মাধ্যমে পেরিয়াস্থের খাঁজ ও ফলের অভ্যন্তরীণ অংশে প্রবেশ করতে সহায়তা করবে। স্প্রে দ্রবণটি সূক্ষ্ম ফোঁটার আকারে ১-৬ মাস বয়সী ফলের পেরিয়াস্থ ও সাধারণ পৃষ্ঠে ছিটানো উচিত, যা হাত স্প্রে বা রকার স্প্রেয়ারের মাধ্যমে করতে হবে। তবে মুকুটের মধ্যে থাকা পরাগায়ন না হওয়া এবং পরিপক্ক ফলগুলিতে স্প্রে করার প্রয়োজন নেই।

মূল খাওয়ানোর পদ্ধতি:
প্রথমে নারকেল গাছের বল অঞ্চল থেকে প্রায় এক মিটার দূরে একটি সক্রিয়, আধা-কঠিন, পেন্সিলের মতো মোটা এবং চকোলেট বাদামি রঙের শিকড় চিহ্নিত করতে হবে। তারপর একটি তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে শিকড়ের ডগায় ৪৫° কোণে একটি তির্যক কাট দিতে হবে। এরপর আজাদিরাচটিন ৫% (৭.৫ মিলিলিটার জলে ৭.৫ মিলিলিটার মিশ্রিত) অথবা আজাদিরাচটিন ১% (১০ মিলিলিটার জলে ১০ মিলিলিটার মিশ্রিত) কীটনাশক দ্রবণ একটি ছোট প্লাস্টিকের পাউচে নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। শিকড়ের কাটা অংশ পুরোপুরি কীটনাশক দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে পাউচের মুখ সুতো দিয়ে ভালোভাবে বাঁধতে হবে। শিকড়টি সাবধানে তির্যক অবস্থানে রাখতে হবে, যাতে কোনো আঘাত না লাগে বা কীটনাশক দ্রবণ বাইরে পড়ে না যায়। অবশেষে, শিকড়টি হালকা পাতার আচ্ছাদন বা আলগা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ:
নারকেল গাছে মাকড় আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাবামেক্টিন ১.৯% ইসি, ক্লোরফেনাপিয়ার ১০% এসসি এবং প্রোপারগাইট ৫৭% ইসি প্রতিটি ১.২৫ মিলিলিটার হারে প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। সাধারণত, প্রতিটি নারকেল গাছে ৫-১০ লিটার স্প্রে দ্রবণ প্রয়োজন হয়, যা গাছের আকার ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। যদি প্রতি একরে ৭০-৮০টি গাছ থাকে, তবে মোট ৩৫০-৮০০ লিটার স্প্রে দ্রবণ প্রয়োজন হতে পারে। এই পরিমাণের ভিত্তিতে, উদাহরণস্বরূপ, ৫০০ লিটার স্প্রে দ্রবণ প্রস্তুত করতে হলে, ৫০০ লিটার জলে ৬২৫ মিলিলিটার কীটনাশক মিশ্রিত করতে হবে (৫০০ লিটার × ১.২৫ মিলিলিটার/লিটার)।

রোগ রুখলেই লক্ষ্মীলাভ রজনীগন্ধায়

আনন্দই হোক বা দুঃখের অনুষঙ্গে একদিন -প্রতিদিনে রজনীগন্ধার চাহিদা অফুরান। চাষের অনুকূল পরিবেশ, রপ্তানির পোক্ত ব্যবস্থা থাকায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে রজনীগন্ধা চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। লিখছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের গবেষক অয়ন প্রামাণিক

শেষ পর্ব

প্রতিকার: ১. জমিতে নিয়মিত নজরদারি করতে হবে। ২.জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ৩. সংক্রমণ শুরু হলে কার্বেনডাজিম @ ১ গ্রাম অথবা কার্বেনডাজিম ১২% + ম্যানকোজেব ৬৩% ডব্লু পি @ ২.৫-৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পাতায় দাগ: অল্টারনারিয়া পলিয়াস্থা (Alternaria polyantha) নামক ছত্রাক এই রোগের উৎস | এই রোগের প্রধান উপসর্গ হল পাতার মধ্যশিরা বরাবর গাঢ় বাদামি রঙের অসম আকৃতির কিন্তু কেন্দ্রিক বলয় যুক্ত দাগের উপস্থিতি । পাতায় সংক্রমণ হলেও এর কারণে গাছের সালোকসংশ্লেষের হার হ্রাস পায় এবং গাছের বৃদ্ধি কম হয়, উৎপন্ন ফুলের গুণমান ভালো হয় না।

প্রতিকার: ১. এই রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য মেটিরাম ৭০% ডব্লু জি @ ৩-৩.৫ গ্রাম অথবা পিকক্সিস্ট্রবিন ২২.৫২% এস সি @ ১-২ মিলি অথবা মেটিরাম ৫৫% + পাইরাক্লস্ট্রবিন ৫% ডব্লু জি @ ২.৫-৩ গ্রাম অথবা কার্বেনডাজিম ১২%+ ম্যানকোজেব ৬৩% ডব্লু পি @ ২.৫-৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলের হিসেবে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কুঁড়ি পচা: এটি একটি ব্যাকটিরিয়া জনিত রোগ। এরউইনিয়া (Erwinia sp.) নামক ব্যাকটিরিয়া রোগটির জন্য দায়ী। আক্রান্ত গাছের পুষ্পদণ্ডে এবং ফুলের বৃন্ত সংলগ্ন অঞ্চলে বাদামি রঙের ভেজা দাগ দেখা যায়। ফুলগুলি বৃন্ত থেকে ঝরে পড়ে।

প্রতিকার:
১. কোনো গাছে সংক্রমণ দেখা দিলে সেটিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে।
২. আক্রান্ত গাছে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি পুনর্ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
৩.উপসর্গ দেখা দিলে স্ট্রেপটোসাইক্লিন দ্রবণ ১ গ্রাম প্রতি ৮-১০ লিটার জলে আঠা সহ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শোলার সাতকাহন

উৎপাদন কমতে থাকায় শোলার বাজারে সংকট চরমে। নতুন টেকনোলজির মাধ্যমে কোনও সংকটেরই সমাধান অসম্ভব নয়। সমস্যার মোকাবিলায় শোলা চাষ পদ্ধতির সুলুক দিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কীটতত্ত্ব বিভাগের গবেষক দেবাশিস মণ্ডল ও অমিত লায়েক

ঐতিহ্যবাহী নবাবগঞ্জ শোলা হাট
গৌড়বঙ্গের একমাত্র প্রাচীন শোলা হাট মালদার নবাবগঞ্জে অবস্থিত, যেখানে বছরে দু'মাস ধরে বুধবার ও রবিবার শোলার বাজার বসে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো ছাড়াও এখানে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার নামকরা শোলা শিল্পীরা শোলা কিনতে আসেন। একসময় প্রচুর শোলা উৎপাদন হলেও বর্তমানে পর্যাপ্ত শোলা না পাওয়ায় এই ঐতিহ্যবাহী হাট বিলুপ্তির পথে। শোলা দুর্গা ও কালী প্রতিমার সাজসজ্জা, পূজোর উপকরণ, বিয়ের মুকুট, শোলার ফুল, মালা ইত্যাদির জন্য অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শোলাপিঠ শিল্পের প্রসার রয়েছে, বিশেষত আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, হুগলি, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কোচবিহার জেলায়। একসময় মালদার রতুয়া, পুরাতন মালদা ও হরিশ্চন্দ্রপুরের জলাভূমিতে শোলা স্বাভাবিকভাবে জন্মাতো, কিন্তু বর্তমানে জলাভূমি হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

শোলা: বৈশিষ্ট্য ও সংকট
শোলা একপ্রকার বর্ষাকালীন জলজ উদ্ভিদ, যা ফ্যাবেসি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। গাছটি প্রায় ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, এর পাতাগুলি লজ্জাবতী গাছের পাতার মতো হয় এবং হলুদ রঙের শিমফুল আকৃতির ফুল ফোটে। বাইরের অংশ খসখসে লালচে হলেও ভেতরের অংশ হালকা কর্কের মতো, যা শুকালে থার্মোকলের চেয়েও কম ওজনের হয়। শোলা দুই প্রকার- ফুলশোলা (এস্কাইনোমিনি অ্যাস্পেরা) ও কাঠশোলা (এস্কাইনোমিনি ইন্ডিকা)। ফুলশোলা হালকা ও সাদা হওয়ায় শিল্পকর্মে বেশি ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে কাঠশোলা শক্ত ও হলদেটে হওয়ায় এটি সাধারণত কর্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আগে গ্রামবাংলার খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, পতিত জলাশয়ে প্রচুর শোলা জন্মাতো, কিন্তু বর্তমানে জলাভূমি পরিষ্কার করে মাছ ও মাখানা চাষ করায় শোলার উৎপাদন কমে গেছে। ফলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত শোলার সংকট দেখা যাচ্ছে।

শোলার তৈরি বিভিন্ন পণ্যের বাজারে এখনও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে বিয়ের মুকুট শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। শোলা সংরক্ষণ ও চাষের উদ্যোগ নেওয়া না হলে কেবল শোলা শিল্পই নয়, শোলা শিল্পীরাও বিলুপ্ত হয়ে যাবেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ জলজ ফসলের ওপর নির্ভরশীল। লাভজনক ফসল হিসেবে শোলা চাষ নিচু জলাভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। তাই এই ঐতিহ্যবাহী ফসল সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল।

শোলা চাষের কৌশল
বীজতলা প্রস্তুতি
শোলা চাষে প্রথমে বীজতলা তৈরি করতে হবে। বৈশাখের শুরুতে এক বিঘা জমির জন্য ২ কাঠা পরিমাণ বীজতলা প্রস্তুত করা উচিত। জমিটিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে এবং প্রথম চাষের সময় বিঘা প্রতি ৩-৪ কুইন্টাল গোবর সার জমিতে দিতে হবে। চূড়ান্ত চাষের সময় বিঘা প্রতি ২ কেজি ইউরিয়া, ১৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৩ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ সার দিতে হবে। সারি পদ্ধতিতে ৪০-৪৫ সেন্টিমিটার দূরত্ব রেখে বীজ বুনতে হবে। সাধারণত বিঘা প্রতি ৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বপনের ১৫-২০ দিন এবং ৩৫-৪০ দিনের মাথায় একবার করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

মূল জমিতে চারা রোপণ ও পরিচর্যা
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতেই ২-৩ বার চাষ দিয়ে মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম চাষের সময় বিঘা প্রতি ৩-৪ কুইন্টাল গোবর সার দিতে হবে। জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, জল আসার আগেই, প্রতি বিঘায় ৪ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৬ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর ৩০ ও ৬০ দিন পরে দুইবার প্রতি বিঘায় ২ কেজি ইউরিয়া সার স্প্রে করা দরকার।
বীজ বপনের দুই মাস পর, যখন চারার উচ্চতা ৭৫-৮০ সেন্টিমিটার হবে, তখন মূল জমিতে চারাগুলো রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭০ সেন্টিমিটার রাখা প্রয়োজন।

পোকামাকড় দমন ও ফসল সংগ্রহ
শোষক পোকা ও আলফালফা ক্যাটারপিলার দমনে বীজ বপনের ১৫ দিন পর প্রতি বিঘায় ৫০ মিলি থায়ামেথক্সাম ১২.৬ শতাংশ + ল্যাম্বডা-সাইহালোথ্রিন ৯.৫ শতাংশ জেড সি ১০০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া, ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০ এসএল (১৭.৮ শতাংশ) প্রতি বিঘায় ৫০ মিলি ১০০ লিটার জলে প্রয়োগ করতে হবে।
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছ সংগ্রহ করতে হবে। গাছ কাটার পর মূল কান্ড রেখে অতিরিক্ত অংশ পরিষ্কার করতে হবে। মোটা কান্ডগুলো ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

শোলা চাষের লাভজনক দিক ও বাজার মূল্য
শোলা চাষ লাভজনক, কারণ এর বাজার মূল্য প্রতি কেজি ২০০-৩০০ টাকা। এক বিঘা জমিতে ১০-১২ কুইন্টাল শোলা উৎপাদন হয়, যা থেকে প্রান্তিক কৃষকরা ২০,০০০-৩৬,০০০ টাকা আয় করতে পারেন। শোলা গাছ ২-৩ বছর পর্যন্ত জমিতে টিকে থাকে এবং প্রতি বছর ফলন দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার রতুয়া, পুরাতন মালদা, হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকে বাণিজ্যিকভাবে শোলা চাষ করা হয়। এই অঞ্চলের জলাভূমি শোলা চাষের জন্য উপযুক্ত হওয়ায় কৃষকদের জন্য এটি একটি লাভজনক উদ্যোগ হতে পারে। শোলা চাষের মাধ্যমে কৃষি খাতকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব এবং এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব।